...সা ... ২
...গতি বিশ্লেষণ ... ৩
নরপ্লান্ট ... ৪
বন্যার পর করণীয় ... ৮

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৪ সংখ্যা ২ শ্রাবণ ১৪০২

গলগন্ড বা ঘ্যাগ

মুহম্মদ মুজিবর রহমান

আয়োডিনের অভাবজনিত অসুখ বা সমস্যা উন্নয়নশীল দেশের জনস্বাস্থ্যের অন্যতম প্রধান সমস্যা। বিশ্বের প্রায় ২০ কোটি (২০০ মিলিয়ন) লোক আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যায় ভুগছে। এর প্রধান সমস্যা হচ্ছে গলগণ্ড বা ঘ্যাগ (Goitre)। এছাড়াও হাবাগোবা ও বামনত্ব (cretinism), মৃত সন্তান প্রসব, গর্ভপাত, মানসিক প্রতিবন্ধকতা, কানে কম শোনা, শারীরিক দুর্বলতা ও প্যারালাইসিস অন্যতম। বাংলাদেশের শতকরা ১০.৫ ভাগ অর্থাৎ প্রায় এক কোটির উপর মানুষ আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। বিশেষ করে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলার শতকরা ৩০ ভাগ এবং ঢাকা, টাঙ্গাইল, খুলনা, চট্টগ্রাম ও পাবর্ত্য জেলার শতকরা ২০ ভাগ লোক এ সমস্যায় ভুগছে।

গলগণ্ড বা ঘ্যাগ হচ্ছে স্বাভাবিক আকারের চেয়ে বড় হয়ে যাওয়া থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ড। আয়োডিনের অভাবে এই অনাকাঙ্ক্ষিত উপসর্গটি দেখা দেয়। আয়োডিনের অভাব হলে যথেষ্ট পরিমাণে থায়রয়েড হরমোন তৈরি হয় না। থায়রয়েড গ্ল্যান্ড এই অভাব পূরণের জন্য অতিরিক্ত কাজ করে। ফলে এই গ্ল্যাণ্ডটি বড় হয়ে যায়।

আয়োডিন একটি রাসায়নিক উপাদান। থায়রয়েড হরমোন তৈরির জন্য আয়োডিনের প্রয়োজন। থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ডের মাধ্যমে থায়রয়েড হরমোন তৈরি হয়। এই হরমোন মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের বৃদ্ধি ও কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন এবং শরীরের তাপ ও শক্তি রক্ষনাবেক্ষণ করে। গলার সামনের দিকে থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ডটি অবস্থিত। এর আকার অনেকটা প্রজাপতির মত।

হাইপোথায়রয়েডিজম (hypothyroidism) হচ্ছে শরীরে পর্যাপ্ত পরিমানে থায়রয়েড হরমোন পাচ্ছে না এমন একটি অবস্থা। রক্তে থায়রয়েড হরমোন পরীক্ষা করে হাইপোথায়রয়েডিজম নির্ণয় করা যায়। হাইপোথায়রয়েডিজম হলে শরীরে অবসাদ, ঘুমভাব, চামড়া খসখসে হওয়া এবং ঠাণ্ডা সহ্য করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। শিশুরা শুধু এ সমস্ত সমস্যায়ই ভোগে না বরং মানসিক অবসাদ, মস্তিস্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের সমূহ ক্ষতি ছাড়াও তাদের দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। নবজাত শিশুদের এ সমস্ত সমস্যা স্থায়ীভাবে দেখা দেয়।

আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি দু'ভাবে

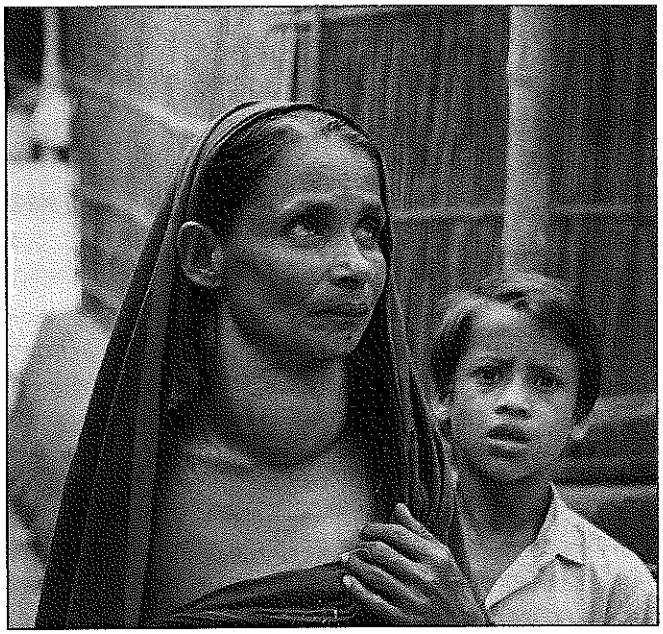

আলবার্ট ফেলসেনস্টাইন

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথমতঃ লোকজন মানসিক ও দৈহিকভাবে দূর্বল হয়। তাদেরকে কোনো কিছু শেখানো এবং বোঝানো কঠিন হয়ে পড়ে। তারা স্বাভাবিক পরিশ্রম করতে পারে না। উপরন্ত তারা অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ আক্রান্ত এলাকায় কৃষিপণ্য হচ্ছে প্রধান অর্থনৈতিক কার্যক্রম অথচ গৃহপালিত পশু মানুষের মতই আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যায় ভোগে। গৃহপালিত পশু আকারে ছোট হয় এবং এদের মাংস, দুধ, ডিম ও লোমের পরিমান কমে যায়। এদের বেশি মাত্রায় গর্ভপাত ছাড়াও প্রায়ই বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।

দৈনন্দিন খাদ্য থেকে আয়োডিন গ্রহণ করা হয়। প্রতিদিন ৮০ থেকে ১৫০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিশু ও গর্ভবতীদের জন্য ২০০ মাইক্রোগ্রাম গ্রহণ করা দরকার। দৈনন্দিন খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি থাকলে তার প্রভাব শরীরের উপর পড়বে অর্থাৎ আয়োডিনের ঘাটতি দেখা দেবে এবং আস্তে আস্তে গলগণ্ডের আকার ধারণ করবে। গলগণ্ডের জন্য শারীরিক অস্বস্তি হয় না বলে প্রাথমিক অবস্থায় কেউ তেমন গুরুত্ব প্রদান করে না। গলগণ্ড থেকে অনেক সময় টিউমার এবং ক্যান্সারও হয়ে থাকে। তাই একে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা উচিত নয়। গলগণ্ডের আকার হিসেবে বিশেষজ্ঞগণ গলগণ্ডকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

শ্রেণী	গলগণ্ড
০	গলগণ্ড নয়
১এ	থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ড বৃদ্ধাঙ্গুলের শেষভাগের আকারের চেয়ে বড়
১বি	থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ড মাথা উচু করলে দেখা যায়
২	থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ড গলা সাধারণভাবে রাখলে দেখা যায়
৩	থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ড ১০ মিটার দূর থেকেও দেখা যায়
৪	থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ড বিশাল আকৃতির

সাধারনতঃ পাহাড়ী এবং উচু এলাকায় উৎপাদিত খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। কারণ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে এ সমস্ত এলাকার মাটি থেকে আয়োডিন কমে যায়। আবার বন্যার ফলেও আয়োডিন ধুয়ে যায়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে সূর্যতাপে সমুদ্র থেকে আয়োডিন বাষ্পীভূত হয়ে বৃষ্টির পানির সাথে মিশে মাটির উপরিভাগ আয়োডিনে সমৃদ্ধ করে, তারপর প্রবল বৃষ্টিপাতে বা বন্যায় তা ধুয়ে পুনরায় নদীর পানির সাথে সমুদ্রে ফিরে যায়। সমুদ্রের পানিতে লিটার প্রতি ৫.০ মাইক্রোগ্রাম, বায়ুমণ্ডলে লিটার প্রতি ০.৭ মাইক্রোগ্রাম এবং মাটিতে কেজি প্রতি ৫.০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন বিদ্যমান। তবে স্থান বিশেষ মাটিতে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। অতএব, যে এলাকার মাটিতে আয়োডিনের পরিমান বেশী সেসব এলাকার মাটিতে উৎপন্ন খাদ্যে আয়োডিনের পরিমান বেশী এবং যেসব এলাকার মাটিতে আয়োডিনের পরিমান কম সেসব এলাকার মাটিতে উৎপন্ন খাদ্যে আয়োডিনের পরিমান কম থাকবে। তাই একই ধরনের খাদ্য ভিন্ন এলাকায় জন্মালে আয়োডিনের পরিমানও ভিন্নতর হবে। সমুদ্রের খাদ্যই হচ্ছে আয়োডিনের প্রধান উৎস। সমুদ্রের মাছে প্রতি কেজিতে ২১০–৬৫৯০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন থাকে। যদি সমুদ্রের মাছ প্রতি সপ্তাহে ২/১ বার খাওয়া যায় তবে তা থেকে প্রতিদিন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন গ্রহণের সমমানের হবে যা গলগণ্ড প্রতিরোধে সক্ষম।

বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে যে শুধুমাত্র আয়োডিনের অভাবই গলগণ্ড সমস্যার একমাত্র কারণ নয়। গয়েট্রোজেন (goitrogen) এবং সায়ানাইড জাতীয় রাসায়নিক উপাদানযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করার ফলেও গলগণ্ড হতে পারে। কারণ গয়েট্রোজেন থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ডে আয়োডিনের উপস্থিতি কমিয়ে দেয়, ফলে থায়রয়েড হরমোন তৈরিতে বাধাগ্রস্ত হয়। তবে এটা নির্ভর করে গয়েট্রোজেন ও আয়োডিনের মাত্রা বা পরিমান এবং থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ডের কার্যকারিতার উপর। যেসমস্ত খাদ্যে গয়েট্রোজেনের উপস্থিতি রয়েছে সেগুলো হচ্ছে— বাঁধাকপি, মূলা, গাজর, কাসাভা, ভুট্টা, মিষ্টি আলু, সরিষা প্রভৃতি। আবার ই. কলাইযুক্ত দুষিত পানি থেকেও এ সমস্যা দেখা দিতে পারে। কাঁচা খাদ্যের চেয়ে রান্না করা খাদ্যে গয়েট্রোজেনের উপস্থিতি কম থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কাঁচা খাদ্যে আয়োডিনের উপস্থিতি রান্না করা খাদ্যের চেয়ে বেশী। কারণ রান্নায় আয়োডিনের মাত্রা কমে যায়। মাছ ভাজলে শতকরা ২০ ভাগ এবং সিদ্ধ করলে ৫৮ ভাগ আয়োডিন নষ্ট হয়। গয়েট্রোজেনযুক্ত খাদ্য গবাদি পশুরা খেলে এদেরও গলগণ্ড হয়ে থাকে এবং এদের দুধেও তা যুক্ত হয় যা খেলে গলগণ্ড হতে পারে।

আয়োডিন গ্রহণের মাধ্যমেই গলগণ্ড এবং এর অভাবজনিত সমস্যা দূর করা সম্ভব। দৈনিক ১০০–৩০০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিনযুক্ত লবন অথবা ভোজ্য তেল গ্রহণের মাধ্যমে আয়োডিনের অভাব মেটানো যেতে পারে। সেই সাথে মূত্র পরীক্ষা দ্বারা আয়োডিনের অভাব এবং গয়েট্রোজেনের উপস্থিতি নির্ণয় করে সময়মত চিকিৎসা করা সম্ভব। পৃথিবীর অনেক দেশই শুধুমাত্র আয়োডিনযুক্ত লবন ব্যবহারের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করেছে।

রক্ত আমাশা

ডাঃ অমল মিত্র

ডাক্তার সাহেবের চেম্বারে অনেক রোগীর ভিড়। তাদের ভেতর থেকে একজন রোগী হঠাৎ কঁকিয়ে উঠলেনঃ আর পারছি নে, উঃ বড্ড ব্যথা।

দু'হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে কোমর গুঁজে যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করছিলেন এতক্ষণ। রোগীর অবস্থা দেখে ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ তাকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ কখন থেকে ব্যথা? আর কি উপসর্গ? রোগী গড়গড় করে বললেন ঃ দু'দিন যাবত অল্প অল্প ব্যথা, গতকাল সকাল থেকে ব্যথাটা বেড়েছে। আর সাথে রক্ত, উঃ .... কথা শেষ হতে না হতেই আবার ব্যথা।

কাটাকুটির লক্ষণমাত্র নেই, অথচ রক্ত?

হ্যাঁ, ঘনঘন পায়খানা, আর সাথে রক্ত রোগী বলতে শুরু করলেন আবার। বুঝতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, এর নাম আমাশা। রক্ত আমাশা। রোগীর যে অবস্থা হয়, তাকে জরুরী না বলে উপায় নেই? পেট ব্যথা, মলদ্বারে শূল, ঘনঘন রক্ত মেশানো পায়খানা, জ্বর, কখনও কখনও মলদ্বারের ভেতরের অংশবিশেষ বেরিয়ে আসে (rectal prolapse)-এরকম লক্ষণ হলে নির্ঘাত রক্ত আমাশা হয়েছে বুঝতে হবে।

আরও এক ধরনের আমাশা আছে, যাকে বলা হয় সাদাআমাশা।

পায়খানার সাথে শুধু আম মেশানো হলে তাকে সাদা আমাশা বলে। সাদা আমাশা হলে মাঝে মাঝে পায়খানায় রক্ত যেতে পারে, তবে পরিমাণ কম। রক্ত আমাশায় যত বেশী ঘনঘন পায়খানা হয়, সাদা আমাশায় আবার তত ঘনঘন পায়খানা হয় না। সাদা আমাশায় মলের পরিমাণ বেশী থাকে এবং মলে দুর্গন্ধ হয় বেশী। এ'দুটো রোগের ভেতর রক্ত আমাশা বেশী হয় শিশুদের এবং সাদা আমাশা বেশী হয় বয়স্কদের কিংবা অপুষ্ট লোকদের।

আমাদের দেশে প্রায় সারা বছরই রক্ত আমাশা লেগে থাকে। উত্তরাঞ্চলে,

যেখানে পানির অভাব বেশী, সেসমস্ত এলাকায় এ রোগটি বেশী দেখা যায়। বছরের শুকনো মৌসুমে অর্থাৎ মে-জুন মাসে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। কখনও কখনও রক্ত আমাশা মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। একজনের রক্ত আমাশা হলে একই পরিবারে আরো অনেকের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়তে পারে। কারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে হাতের সংস্পর্শে রোগী থেকে এ রোগের জীবাণু অন্যের শরীরে ঢুকে যেতে পারে। এ রোগ এতই সংক্রামক যে মাত্র ১০ থেকে ১৫টা জীবাণু (যা খালি চোখে দেখা যায় না) যদি হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে লুকিয়ে থাকে আর সেই জীবাণু পেটে গিয়ে দ্রুত বংশ বিস্তার করে রোগের লক্ষণ শুরু করে দিতে পারে। তবে যেহেতু জীবাণু খাবারের মাধ্যমে বা আঙ্গুলের সাহায্যে মুখ দিয়েই শরীরে যায়, অতএব নিম্নোক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মেনে চললে বেশ সহজেই এ রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১. খাওয়ার আগে এবং মলত্যাগের পর সাবান দিয়ে পরিষ্কারভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস করতে হবে

২. হাতের নখ ছোট করে কেটে রাখতে হবে

৩. খাবারে যাতে মাছি না বসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে

৪. খোলা জায়গায় মলত্যাগ থেকে বিরত থাকতে হবে

৫. কাঁচা সব্জীতে বা রাস্তা-ঘাটে খোলা অবস্থায় যে খাবার থাকে, তার ভেতর এ রোগের জীবাণু থাকতে পারে, তাই এ সমস্ত খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে

৬. যেখানে এক সময় বা এক সাথে অনেক লোকের সমাগম হয়, যেমন মেলা, যাত্রা বা ধর্মীয় সম্মেলন, কিংবা যদি এক সাথে অনেক লোক একত্রে থাকে, যেমন ব্যারাক, মেস বা হোষ্টেল, সেসমস্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত সতর্কতা ও পরিচ্ছন্নতার অভাবে কিংবা লোকজনের ঘনিষ্টভাবে মেলামেশার কারণে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। ছোট ছোট বস্তিতে যারা একসাথে অনেকে বাস করে তাদের মধ্যে একজনের রোগ হলে অনায়াসে তা অন্যের শরীরে বিস্তার করতে পারে। অতএব এ সমস্ত ক্ষেত্রে খাওয়া-দাওয়া, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

রক্ত আমাশা হলে রোগী যেমন বেশ কষ্ট পান, এর চিকিৎসাও তেমন অনেকাংশে সহজ নয়। দ্রুত চিকিৎসা না হলে রোগী মারাত্মক জটিলতার শিকার হতে পারেন। তবে চিকিৎসার জটিলতার প্রধান কারণ বলা যায় ঃ বেশ কিছু ওষুধ ধীরে-ধীরে অকার্যকর হয়ে পড়ছে। আগে যে সমস্ত ওষুধে এ রোগ ভালো হতো, এখন সে রকম বেশ কয়েকটি ওষুধ এ রোগ সারাতে পারে না। ফলে দিনদিন বেশী দামী ও দুষ্প্রাপ্য ওষুধের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়ছে। ওষুধের এই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কি রোধ করা সম্ভব? অন্ততঃ একটা কারণ ওষুধের নিষ্ক্রিয়তার সাথে জড়িত, তা হলো ফার্মেসী চিকিৎসা অর্থাৎ ডাক্তারের পরামর্শপত্র ছাড়া যত্র-তত্র রোগ নির্ণয় না করে ফার্মেসীর মাধ্যমে যেকোনো এন্টিবায়োটিক বিক্রয়। আমাদের মধ্যে মুড়ি-মুড়কির মতো এন্টিবায়োটিক খাওয়ার একটি সহজ প্রবণতা আছে। এই প্রবণতা পরিহার করা প্রয়োজন। তাছাড়া ওষুধের সঠিক প্রয়োগ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট রোগে নির্দিষ্ট মাত্রায় সঠিক ব্যবহারের সপক্ষে প্রয়োজনীয় শীতিমালা ও একটি সুস্থ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

রক্ত আমাশা চিকিৎসায় কয়েকটি কার্যকর ওষুধ ঃ

ওষুধের নাম		ওষুধের মাত্রা
নেলিডিক্সিক এসিড	শিশু	৫৫ মিঃ গ্রাম/কেজি হিসেবে প্রতিদিন মোট ৫ দিন দৈনিক মাত্রাকে ৪ ভাগ করে ৬ ঘন্টা পরপর খেতে হবে
	বয়স্ক	৫০০ মিঃ গ্রাম করে ৬ ঘন্টা পরপর মোট ৫ দিন খেতে হবে
পিভমেসিলিনাম (সেলিক্সিড)	শিশু	৬০ মিঃ গ্রাম/কেজি হিসেবে প্রতিদিন মোট ৫ দিন। একইভাবে ৬ ঘন্টা পরপর খেতে হবে
	বয়স্ক	৪০০ মিঃ গ্রাম করে ৬ ঘন্টা পরপর মোট ৫ দিন খেতে হবে

উল্লেখ্য যে মেট্রোনিডাজল কখনই রক্ত আমাশার ওষুধ নয়। তাছাড়া এমপিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন ও কো-ট্রাইমোক্সাজল বর্তমানে বেশীরভাগ রক্ত আমাশায় অকার্যকর।

আরও উল্লেখ্য যে পায়খানা পরীক্ষা করে সঠিক ওষুধ নির্বাচন করা যায়। ওষুধ নির্বাচনের জন্য অবশ্যই আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন।

যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করার উপায়

ডাঃ মহসীন উদ্দীন আহমেদ
ডাঃ তানজীনা মির্জা

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট সক্ষম দম্পতির প্রায় অর্ধেক কোনো না কোনো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করছেন। এ অবস্থায় পৌছুতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর প্রায় ২০ থেকে ২৫ বছর সময় লেগেছে। বর্তমান গ্রহিতার এ হারকে ধরে রেখে ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য সেবার মানকে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেবার মানের মধ্যে সংক্রমণ প্রতিরোধ একটি বিশেষ দিক। কপার-টি, ইনজেকশন, নরপ্লান্ট এবং বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতিগুলো প্রদানের সময় সংক্রমণ প্রতিরোধ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য করা গেছে যে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলে এর কারণে অনেক গ্রহিতা পদ্ধতি গ্রহণের পর বন্ধ করে দেন।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছাড়াও একটি হাসপাতালের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সংক্রমণ প্রতিরোধ কার্যক্রম সমান গুরুত্বপূর্ণ। এসব দৈনন্দিন কাজের মধ্যে কাটা-ছেঁড়া-জখমের পরিচর্যা, রক্ত পরীক্ষা, টিকা প্রদান, সাধারণ ড্রেসিং, প্রসবের ব্যবস্থাপনা, আই.ভি.স্যালাইনসহ নানা রকম ইনজেকশন প্রদান, রক্ত পরিসঞ্চালন ও বিবিধ অপারেশন করা অন্যতম।

এতদিন পর্যন্ত রোগী বা সেবাগ্রহিতাকে রক্ষা করাই ছিল সংক্রমণ প্রতিরোধের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু দু'টি ঘাতক ব্যাধি এইডস এবং হেপাটাইটিস বি সংক্রমণ প্রতিরোধের এ উদ্দেশ্যকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। এইডস এবং হেপাটাইটিস বি মূলতঃ দেহের রক্ত এবং অন্যান্য তরল পদার্থের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় এরোগ দু'টির বাহ্যিক তেমন কোনো উপসর্গ থাকে না বলে সাধারণভাবে এদের চিহ্নিত করা সহজ নয়। তাই শুধুমাত্র রোগী বা সেবাগ্রহিতাকে

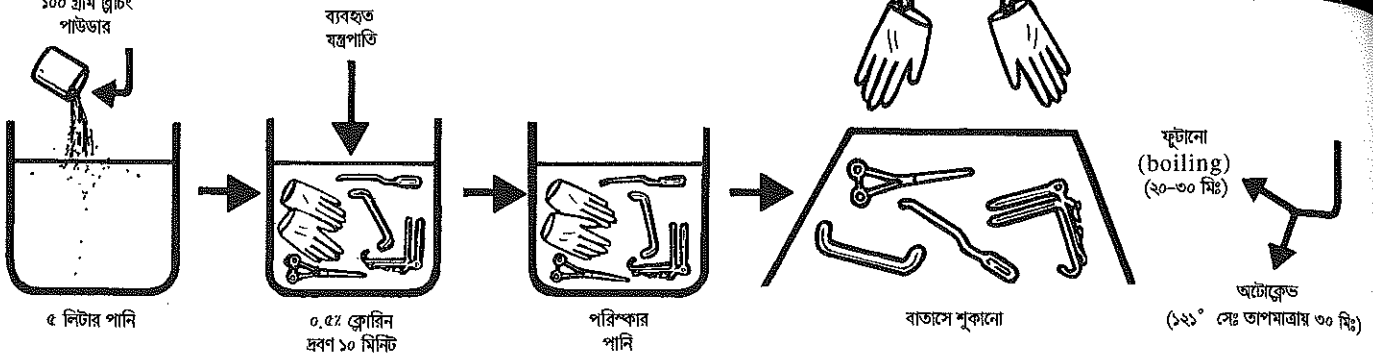

সংক্রমণ থেকে রক্ষা করা নয় বরং প্রদানকারীকেও রক্ষা করা সংক্রমণ প্রতিরোধের একটি বিশেষ লক্ষ্য।

হাসপাতাল ও পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, গ্লাভস্ ও আনুষাঙ্গিক সামগ্রী প্রচলিত পদ্ধতিতে যেভাবে জীবাণুমুক্তকরণ করা হয় তাতে একটি নতুন ধাপ অন্তর্ভুক্ত করে সংক্রমণের এ সম্ভাবনাকে সীমিত করা যায়। এ ধাপটির নাম বিশোধন (decontamination)। ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, গ্লাভস্ ও আনুষঙ্গিক সামগ্রীগুলোকে ০.৫% ক্লোরিণ দ্রবনে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখাকে বিশোধন বলা হয়। এই ক্লোরিণ দ্রবন এইডস ও হেপাটাইটিস বি ভাইরাসকে ধ্বংস করতে সক্ষম। দশ মিনিট ডুবিয়ে রাখার পর সেবা কেন্দ্রের সহকারী কেউ তার হাতে ইউটিলিটি গ্লাভস্ লাগিয়ে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রীগুলো ক্লোরিণ দ্রবন থেকে তুলে নিয়ে সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে জীবাণুমুক্তকরণের পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুতি নিবেন।

পরবর্তী ধাপের বিবরণ উল্লেখ করা প্রয়োজন। জীবাণুমুক্তকরণ সাধারণতঃ দু'ভাবে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে — ফুটানো এবং অটোক্লেভ। ফুটন্ত পানিতে ২০ থেকে ৩০ মিনিট এবং অটোক্লেভে ১২১° সেঃ তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট পর্যন্ত রাখার ফলে যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত হবে। এক্ষেত্রে অটোক্লেভ একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

ক্লোরিণ দ্রবন তৈরি করা খুবই সহজ এবং তেমন একটা ব্যয় সাপেক্ষ নয়। বাজারে যেসব ব্লিচিং পাউডার কিনতে পাওয়া যায় তা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে প্রতিটিতেই যথাযথ পরিমান ক্লোরিণ আছে। একশত গ্রাম ব্লিচিং পাউডার ৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে ০.৫% ক্লোরিণ দ্রবন তৈরি করা সম্ভব। সেবা কেন্দ্রের চাহিদা মত প্রতিদিন কাজ শুরু করার আগে দ্রবন তৈরি করা আবশ্যক। একই দ্রবন বেশ কয়েকবারও ব্যবহার করা সম্ভব। দিন শেষে ব্যবহৃত দ্রবন ফেলে দিতে হবে এবং পরের দিন আবার নতুন করে এ দ্রবন তৈরি করতে হবে।

ব্লিচিং পাউডার ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় রাখা প্রয়োজন। ক্লোরিণ দ্রবন ক্ষয়কারক (corrosive) বিধায় বেশ কিছুদিন ব্যবহারের ফলে যন্ত্রপাতির কিছুটা ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে। এ দ্রবনের একটা সহনীয় ঝাঁঝালো গন্ধ আছে। ব্যবহারের পর ক্লোরিণ দ্রবন যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না, কারণ এ দ্রবন মাছ ও উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর।

এইডস এবং হেপাটাইটিস বি সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রচলিত জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতিতে বিশোধন ধাপটি অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিসংগত। ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সেন্টার এবং মিটফোর্ড হাসপাতালের মডেল ক্লিনিকে ক্লোরিণ দ্রবন ব্যবহারের মাধ্যমে 'বিশোধন' ধাপটি প্রচলিত আছে। সম্প্রতি আইসিডিডিআর,বি-এর মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্প্রসারণ প্রকল্প (গ্রামীন) থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংক্রমণ প্রতিরোধের এমনি একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর প্রস্তুতিপর্বে অভয়নগর থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার, সেবিকা এবং পরিবার কল্যান পরিদর্শিকাদের সমন্বয়ে তিনদিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

নরপ্লান্ট

নিরাপদ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

এমদাদুর রহমান

কয়েকটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিরীক্ষা ও গবেষণা করে নরপ্লান্ট প্রবর্তন করা হয়। ১৯৮৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং ১৯৯০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ড্রাগ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন নরপ্লান্টকে কার্যকর, দীর্ঘমেয়াদী এবং অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে অনুমোদন করে। যুক্তরাষ্ট্রসহ ২০টি দেশের ১২ লক্ষাধিক মহিলা নরপ্লান্ট ব্যবহার করছেন। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সুদীর্ঘ ৪০ বছরের ইতিহাসে নরপ্লান্ট সর্বশেষ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। আশির দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে আমাদের দেশে এর প্রবর্তন করা হয়। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার দ্বারা ৩৯টি ক্লিনিকের মাধ্যমে মহিলাদের কনুইয়ের একটু ওপরে নরপ্লান্ট পরিয়ে দেয়া হয়।

নরপ্লান্ট কি?

নরপ্লান্ট মহিলাদের ব্যবহারযোগ্য একটি দীর্ঘমেয়াদী, কার্যকর এবং অস্থায়ী গর্ভনিরোধক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। সাধারণ নরপ্লান্ট ও নরপ্লান্ট-২ নামের দু'ধরনের নরপ্লান্ট আছে :

১. সাধারণ নরপ্লান্ট দিয়াশলাই'র কাঠির চেয়ে ছোট ৬টি কাঠি বা ক্যাপসুলের সমন্বয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি কাঠি বা ক্যাপসুল ৩৪ মিলিমিটার লম্বা, ২.৪ মিলিমিটার চওড়া এবং ৩৬ মিলিগ্রাম লেভোনরজেস্ট্রেল (Levonorgestrel) নামক কৃত্রিম প্রজেস্টেরণ (Progesterone) হরমোন দ্বারা তৈরি যা খাওয়ার বড়ির মধ্যে আছে। আমাদের দেশে এ জাতীয় নরপ্লান্ট ব্যবহার করা হচ্ছে।

২. নরপ্লান্ট-২-এর প্রত্যেকটি কাঠি বা ক্যাপসুল ৪৪ মিলিমিটার লম্বা এবং ৭০ মিলিগ্রাম লেভোনরজেস্ট্রেল হরমোন দ্বারা তৈরি। নরপ্লান্ট-২ দু'টি ক্যাপসুলের সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের দেশে এর প্রচলন নেই।

মেয়াদ

সাধারণ নরপ্লান্ট ৫ বছর পর্যন্ত গর্ভনিরোধ করতে পারে। অনেকে একে ৫ বছরের ইনজেকশন বলে থাকে। নরপ্লান্ট-২ তিন বছর পর্যন্ত গর্ভনিরোধ করতে পারে। উভয় প্রকার নরপ্লান্টেরই মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আর কার্যক্ষমতা থাকে না। তখন একে খুলে ফেলতে হয়। ইচ্ছা করলে গ্রহীতা পুনরায় নরপ্লান্ট নিতে পারেন।

নরপ্লান্ট গর্ভনিরোধের ক্ষেত্রে যেভাবে কাজ করে

নরপ্লান্ট পরানোর পরপরই লেভোনরজেস্ট্রেল হরমোন প্রতিনিয়ত

(৬-এর পাতায় দেখুন)

স্বাস্থ্য শিক্ষার বিশেষ পদ্ধতি

এ.কে.এস. মাহমুদুর রহমান

সাধারণভাবে স্বাস্থ্য শিক্ষা বলতে একে অন্যের মধ্যে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যের আদান-প্রদানকে বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিশুর পাতলা পায়খানা হলে তাকে খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে এবং পাশাপাশি তাকে তার স্বাভাবিক খাবার খাওয়াতে হবে, যেমনঃ বুকের দুধ খেতে দিতে হবে। এক কথায় স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। ফলে জনগণ তাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং সুযোগমতো সঠিক সময়ে উপযুক্ত স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত, প্রতিরোধ ও উন্নত জীবনযাপন করতে পারে।

জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের দেশে অনেকদিন ধরে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ও মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। এসব প্রচলিত স্বাস্থ্য শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে ঃ দলীয় আলোচনা, একক আলোচনা, ভূমিকা অভিনয়, নাটক, জারিগান, রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, পোষ্টার প্রদর্শন, লিফলেট বিতরণ, জনসভা, র‍্যালী, পদযাত্রা ইত্যাদি। এসব প্রতিটি পদ্ধতির কিছুকিছু ভাল দিক থাকা সত্বেও প্রতিটির আবার বেশ কিছু কার্যকরী সীমাবদ্ধতা আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিতরণকৃত অধিকাংশ লিফলেটই জনগণ পড়ে না, কারণ এগুলোতে জনগণের চাহিদা বা তাদের আসল সমস্যার কথা বলা হয় না। তাছাড়া অনেক পদ্ধতিই শুধুমাত্র একতরফা তথ্য সরবরাহ করে থাকে যা সচরাচর উপদেশমূলক (didactic)। উপরন্ত প্রচলিত স্বাস্থ্য শিক্ষা পদ্ধতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্বাস্থ্য বার্তায় ব্যক্তি বিশেষের দোষকে বড় করে ধরা হয় (victim blaming) এবং সামগ্রিক অবস্থা ও তার প্রভাবগুলোকে উপেক্ষা করা হয়।

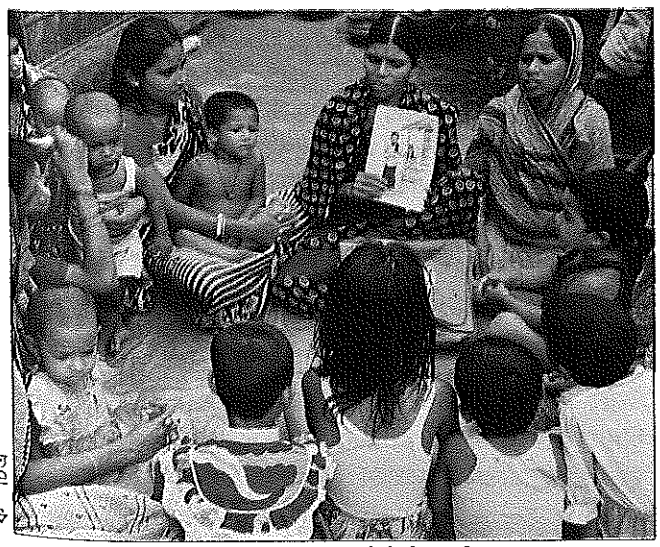

ফকরুল আলম

"ক" চিত্র

যেহেতু জনগণ বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতির শিকার, সম্ভবতঃ সে কারণেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য তথ্য খুব একটা কার্যকর হয় না। একতরফাভাবে তথ্য বা জ্ঞান সরবরাহ করা হলে শ্রোতাগণ তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার কথা প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারেন না। বক্তা জ্ঞানের ভাণ্ডার হলেও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না বা আচার-আচরণ বা মনোভাবের পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একটি উপযুক্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত। যে স্বাস্থ্য শিক্ষা পদ্ধতিতে জনগণের অনুভূত প্রয়োজন ও চাহিদার স্থান আছে এবং অসুস্থতার মূল কারণ বা স্বাস্থ্য-নির্ধারক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ থাকে সে ধরনের ব্যবস্থাই হবে একটি উপযুক্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা পদ্ধতি। এ পদ্ধতি একটা দ্বিমুখী প্রক্রিয়া যা সংলাপ-ভিত্তিক এবং কেবলমাত্র তথ্যের সম্প্রসারণ বা তথ্য সরবরাহমূলক নয়। যদিও প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল অংশ, তবুও স্বাস্থ্য শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা জনগণের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, যেমন সম্পদ প্রাপ্যতা বা দারিদ্র্য বিমোচন এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীগণ তথ্যের নীরব শ্রোতা না হয়ে বরং মূল আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হবেন। এখানে অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য সম্বলিত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করাই হবে প্রশিক্ষকের মূল ভূমিকা।

এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের সামনে কোনো একটি বিষয়ের উপর একটি সমস্যা তুলে ধরবেন এবং তাদেরকে বিষয়টি ভাল করে বুঝতে বা সমস্যাটি ভাল করে দেখতে বা শুনতে বলবেন এবং চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে আলোচনা শুরু করতে বলবেন। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদেরকে — কি, কেন, কখন, কে, কোথায় এবং কিভাবে — এমন ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

এ ধরনের একটি স্বাস্থ্য শিক্ষা পদ্ধতি 'ক' চিত্রে দেখানো হয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে একজন স্বাস্থ্যকর্মী কিভাবে অংশগ্রহণকারীদেরকে কি, কেন, কখন, এমন সব প্রশ্ন করে তাদের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে সাহায্য করছে।

"ক" চিত্র ঃ একটি সমস্যা-ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষাদান পদ্ধতি। এ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ডায়রিয়া-সংক্রান্ত একটি উপযুক্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিচালনা করার জন্য "খ" চিত্রটি আঁকা হয়েছে। একজন স্বাস্থ্যকর্মী

"খ" চিত্র

চিত্রটি অংশগ্রহণকারীদেরকে দেখিয়ে তাদেরকে নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করতে পারে। "খ" চিত্র ঃ ডায়রিয়া-সংক্রান্ত সমস্যা-ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিচালনা করার একটি চিত্র।

অংশগ্রহণকারীদের যেসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে ঃ

- এ ছবিতে আপনারা কি কি দেখতে পাচ্ছেন?
- ছবিটিতে কে কি করছে?

- কেন এমন ধরনের কাজ করছে বলে আপনি মনে করেন?
- কি অসুখ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে?
- কেন তার এ অসুখ হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?
- আপনার বাচ্চার কি কখনও এমন অসুখ হয়েছে?
- এ অসুখ হলে কি কি অসুবিধা হয়?
- কিভাবে এ অসুখ হয়েছে বা কেন এ অসুখ হয়েছে?
- এ অসুখ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আপনারা কি কি করতে পারেন?
- এসব কাজ করার জন্য আপনারা কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হবেন?
- আপনারা কিভাবে এসব অসুবিধা দুর করবেন?
- এছাড়া আপনারা আর কি কি করতে পারেন?

অংশগ্রহণকারীগণ এ প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের নিজেদের সমস্যা সমাধানের পথ নিজেরাই খুঁজে বের করবেন। তবে এখানে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়টি অংশগ্রহণকারীদের পরিচিত একটি ঘটনা বা সমস্যামূলক বিষয় হতে হবে। ঘটনা বা বিষয়টি সহজ, সরল ও অপ্রয়োজনীয় তথ্যমুক্ত হতে হবে এবং একটি মাত্র সমস্যার উপর ভিত্তি করে পুরো ঘটনাটি সাজাতে হবে।

কিন্তু এ পদ্ধতির প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো ছোট-ছোট দলে ভাগ করে কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক জনগণকে স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া যায়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে এ পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা দিতে হলে অনেক ব্যয় সাপেক্ষ ও অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া স্বাস্থ্যকর্মীকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। অন্য দিক থেকে বিচার করলে এটি একটি উপযুক্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা পদ্ধতি। এখানে অংশগ্রহণকারীগণ তাঁদের নিজেদের ভাষায়, নিজেদের মতো করে কথা বলতে ও শিখতে পারেন এবং বহিরাগতদের চাপানো বুলি থেকে তাঁরা মুক্ত থাকেন। অংশগ্রহণকারীগণ নিজেরাই আলোচনার মাধ্যমে যতদুর সম্ভব তাঁদের সমস্যাগুলোর সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হন। এ পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য শিক্ষাদান করলে প্রশিক্ষণার্থীদের আত্ম-বিশ্বাস বেড়ে যায় এবং লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে তাদেকে স্বনির্ভর করে তুলতে সাহায্য করে। ফলে জনগোষ্ঠীর কাঙ্খিত আচার-আচরণ ও মনোভাবের সামগ্রিক পরিবর্তন করা সম্ভব।

৮-এর পাতার পর

বন্যা পরবর্তীকালে

- সাপে কাটা রোগীকে ওঝা বা কবিরাজের কাছে নেবেন না। সাপে কাটা মাত্র ক্ষতস্থানের চার আঙ্গুল ওপরে দড়ি, শাড়ীর পাড় বা পায়জামার ফিতা দিয়ে কষে একাধিক বাঁধ দিন। দংশিত ব্যক্তিকে ঘুমাতে দেবেন না। দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তর করুন।
- পানিতে ডুবে যাওয়া শিশু বা ব্যক্তিকে দ্রুত উদ্ধার করুন। পেটে চাপ দিয়ে পানি বের করে ফেলুন। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চালনের চেষ্টা করুন। এ ব্যাপারে দক্ষ ব্যক্তির সাহায্য নিন। তার কাছে আগেভাগেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।

৪-এর পাতার পর

নরপ্লান্ট

স্বল্পমাত্রায় নি:সৃত হয়ে রক্তের সংগে মিশে নিম্নেবর্ণিত উপায়ে গর্ভনিরোধ করে থাকে :

১. ডিম্বাশয়ে ডিম পরিপক্ক হতে দেয় না
২. জরায়ুর নি:সৃত লালাকে ঘন ও আঠালো করে ফেলায় শুক্রাণু ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না এবং
৩. সম্ভবত: জরায়ুতে নিষিক্ত ডিম (ফার্টিলাইজড ওভা) অবস্থান করার প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

নরপ্লান্টের কার্যক্ষমতা

১০০ জন মহিলা নরপ্লান্ট গ্রহণ করলে এদের ৯৯ জনেরও বেশি গর্ভনিরোধ করতে পারেন। এটি খাবার বড়ি ও আই.ইউ.ডি. থেকে বেশি কার্যকর।

কারা নরপ্লান্ট নিতে পারে

দীর্ঘদিন গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকার জন্য যারা খাওয়ার বড়ি, ইনজেকশন এবং আই.ইউ.ডি. পছন্দ করে না; রোজ রোজ খাওয়া এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে ব্যবহার করতে ঝামেলা মনে করে; কাম্য সন্তানের মা হয়েও বন্ধ্যাকরণ করতে চায় না; যারা বন্ধ্যাকরণের জন্য অনুপযুক্ত বিবেচিত এবং যাদের এস্ট্রোজেনজাতীয় জন্মনিরোধক গ্রহণে সমস্যা আছে তারা এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন।

কারা নরপ্লান্ট নিতে পারে না

গর্ভবতী হলে, লিভারের অসুখ থাকলে, জন্ডিস থাকলে, কারণবিহীন রক্তস্রাব হলে, হৃদরোগ থাকলে, স্তনে চাকা বা টিউমার থাকলে, স্তন্যদানকারী মহিলা হলে এবং মানসিক রোগ থাকলে কেউ নরপ্লান্ট নিতে পারে না।

সুবিধা

এটি খুবই কার্যকর পদ্ধতি। গ্রহণকারীর স্বাভাবিক কাজকর্ম ও চলাফেরা করতে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না, চাপ দিলে ব্যথা লাগে না, বাইরে থেকে দেখা যায় না, একবার গ্রহণ করলে ৫ বছর নিশ্চিন্তে থাকা যায়, গ্রহণকারীর ইচ্ছানুযায়ী খোলা যায়, গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়, পরবর্তী সন্তান নেয়ার মাঝে প্রয়োজনীয় ব্যবধান রাখা যায়, সহবাসের সংগে এর ব্যবহারের কোনো সম্পর্ক নেই, দৈনিক বড়ি খাবার এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্যবহার করার ঝামেলা নেই এবং খুলে ফেলার পর সন্তান ধারণের জন্য বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয় না।

অসুবিধা

বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার দ্বারা পরাতে হয় এবং পরানো যত সহজ খুলে ফেলা তত সহজ নয়। নরপ্লান্ট পরানোর স্থানে চামড়ার কাটা দাগ ফুলে থাকে এবং এর সাধারণ কতগুলো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আছে।

কখন কিভাবে নিতে হয়

মাসিক শুরু হওয়ার ৫ দিনের মধ্যে নিতে হয়। তবে মাসিক শুরুর ৭ দিনের মধ্যেও নেয়া যায়। গর্ভপাত বা এম.আর. করার পরপরই নিতে হয়। কোনো মহিলা আগ্রহ প্রকাশ করলেই নরপ্লান্ট পরিয়ে দেওয়া যায় না। নরপ্লান্ট পরানোর আগে কয়েকটি বাছাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার মহিলাদের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস জেনে এবং শারীরিক পরীক্ষা করে নির্ধারণ করেন নরপ্লান্ট পরানো যাবে কিনা। মহিলাদের কনুইয়ের একটু ওপরে হাত পাখার মতো করে ৬টি ক্যাপসুল

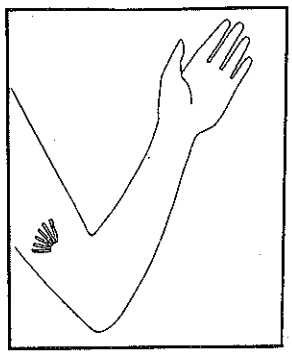

ঢুকিয়ে দেয়া হয়। নরপ্লান্ট পরানোর আগে ঐ জায়গাটুকু অবশ করে নিয়ে ২ থেকে ৪ মিলিমিটার চামড়া কেটে ফাঁক করে চামড়ার নিচে মাংসের ওপরে ক্যাপসুলগুলো ঢুকিয়ে দেয়া হয়। চামড়ার কাটা অংশটি গজ কাপড় ও আঠালো ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে দিতে হয়। ক্ষতস্থান ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যে শুকিয়ে যায়।

সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

নরপ্লান্ট নেয়ার পর প্রথম মাসিকে বেশি দিন রক্তস্রাব হতে পারে; দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে সামান্য রক্তস্রাব বা ফোঁটা-ফোঁটা রক্তস্রাব হতে পারে; মাসিক বন্ধ থাকতে পারে; মাথাব্যথা, বমি-বমি ভাব, ওজন বাড়া, মন বিষন্ন থাকা এবং ঘুম-ঘুম লাগা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

নরপ্লান্টের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার জন্য ভয়ের কোনো কারণ নেই। সব গ্রহণকারী মহিলাদেরই পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এমন নয়। সব ধরনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ারই প্রতিকার বা সমাধান সম্ভব।

জটিলতা

খুবই কম সংখ্যক গ্রহণকারীর মধ্যে নিম্নেবর্ণিত জটিলতা দেখা দিতে পারে। তবে এর যেকোনো একটি জটিলতা দেখা দেওয়া মাত্র ডাক্তারের সংগে যোগাযোগ করতে হয় :

ঘন-ঘন প্রচন্ড মাথাব্যথা ও চোখে ঝাপসা দেখা, হাতে ব্যথা, নরপ্লান্ট পরানোর জায়গা ফুলে যাওয়া, লাল হওয়া এবং পুঁজ বা রক্তক্ষরণ হওয়া, নরপ্লান্টের ক্যাপসুল বের হয়ে আসা, তলপেটে ব্যথা এবং অত্যধিক রক্তস্রাব।

উপরে যেসব পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও জটিলতার কথা বলা হয়েছে এগুলো সাধারণ খাবার বড়ি গ্রহণের ফলেও দেখা দিতে পারে। অনেকেই মনে করেন, নরপ্লান্ট খাবার বড়ি, ইনজেকশন ও আই.ইউ.ডি. থেকে উত্তম। পাঁচ বছর পর্যন্ত গর্ভনিরোধের জন্য নরপ্লান্ট একটি কার্যকর পদ্ধতি।

স্বাস্থ্য কুইজ-১৩

১. বিশ্বের কয়টি দেশ পোলিও মুক্ত হয়েছে এবং বাংলাদেশে পোলিও রোগ নির্মূলের ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

২. একজন রোগী কখন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে বলে সন্দেহ করবেন?

৩. বাংলাদেশের কত ভাগ লোক স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থার আওতায় এসেছে?

৪. কৃমি রোগ কিভাবে প্রতিরোধ করবেন?

৫. ঢেঁকি ছাটা চালে কি ভিটামিন থাকে এবং এর অভাবে কি রোগ হয়?

(উত্তর আমাদের হাতে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫-এর আগে পৌছাতে হবে)

স্বাস্থ্য কুইজ-১২-এর উত্তর

১. প্রসবোত্তর মায়েরা তিন দিনের দিন দুধজ্বরে আক্রান্ত হন। প্রথম সন্তান প্রসবকারী মায়েরা এই জ্বরে বেশী আক্রান্ত হন।

২. নবজাতকদের মধ্যে প্রায় ৬০ ভাগ শিশুর জন্মের দ্বিতীয় দিন থেকে ৫ দিনের মধ্যে যে জন্ডিসে আক্রান্ত হয় তাকে ফিজিওলজিক্যাল বা স্বাভাবিক জন্ডিস বলে। এই জন্ডিসে শিশুর অন্যান্য লক্ষণ স্বাভাবিক থাকে। এই জন্ডিসে আক্রান্ত শিশুর চোখ শুকনা কাপড় দিয়ে ঢেকে, মাথাটি ছায়াতে রেখে সকালের রোদ শরীরে লাগাতে হবে এবং বেশি করে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। শিশুটি ১০ দিনের মধ্যে জন্ডিস থেকে সেরে উঠবে।

৩. শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি হচ্ছে কি না জানার জন্য ওজন, উচ্চতা ও মধ্য বাহুর মাপ নেওয়া হয়।

৪. : ৪ অথবা ৬ ঘন্টা অন্তর অন্তর ডায়রিয়া রোগীর দেহের তাপমাত্রা ও নাড়ীর গতি মনিটর করতে হবে।

: রোগীর অবস্থানুযায়ী আধা ঘন্টা পরপরও দেহের তাপমাত্রা ও নাড়ীর গতি মনিটর করতে হবে অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী দেহের তাপমাত্রা ও নাড়ীর গতি মনিটর করতে হবে।

: প্রত্যেকবারই ডায়রিয়া রোগীর দেহের তাপমাত্রা ও নাড়ীর গতি একটি চার্টে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে যা দেখে বুঝা যাবে রোগীর অবস্থা উন্নতি না অবনতির দিকে যাচ্ছে।

৫. এই মহিলার ছোট সন্তানের বয়স যদি ১ বৎসর বা তার বেশী হয় তবে তার জন্য মহিলা বন্ধ্যাকরণই হবে আদর্শ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি। কারণ যেকোনো পদ্ধতি অপেক্ষা মহিলা বন্ধ্যাকরণের কার্যক্ষমতার হার বেশী এবং পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার হার খুবই কম বা নাই বললেই চলে। কিন্তু দুই সন্তানের জননীর ছোট সন্তানের বয়স ১ বৎসরের কম হলে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের নিয়মানুযায়ী বন্ধ্যাকরণ করতে পারেন না। তিনি তখন মধ্যকালীন পদ্ধতি হিসেবে ইনজেকশন বা অন্য যেকোনো অস্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। ছোট সন্তানের বয়স ১ বৎসর পূর্ণ হলে বন্ধ্যাকরণ করে নিতে পারবেন।

স্বাস্থ্য কুইজ-১২-এর সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

১. সুলতানা আলেয়া
৬১৯/এ দামপাড়া,
১ম লেইন, চট্টগ্রাম

২. ডাঃ মোঃ হারুন আল মামুন
পরিবার পরিকল্পনা সমিতি
সি এন্ড বি রোড, জামালপুর-২০০০

৮-এর পাতার পর

জেনে রাখা ভাল

বসতে হবে। এরপর গজ, তূলা বা কাপড়ের টুকরা ভাঁজ করে মুখে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে রাখতে হবে। রোগী যাতে ঢোক না গিলে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঢোঁক গিলা বন্ধ করলে রক্ত জমাট বেঁধে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। রক্ত পড়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এভাবে থাকতে হবে।

* যদি এসব ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ না হয় তবে রোগীকে দ্রুত স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিতে হবে।

* রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেলেও রোগীর নাক দিয়ে রক্ত পড়ার যথাযথ কারণ নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়।

জেনে রাখা ভাল

নাক দিয়ে রক্ত পড়লে করণীয়

নাক দিয়ে রক্ত পড়া একটি জরুরী স্বাস্থ্য সমস্যা। যদিও নাক দিয়ে রক্ত পড়া রোগীর সংখ্যা খুব একটা বেশী নয়, তবুও সময়মত ব্যবস্থা না নিলে রোগীকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। হঠাৎ করে নাক দিয়ে রক্ত পড়লে কিছু সহজ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

রক্ত বন্ধে করণীয়

* প্রথমতঃ রোগীকে স্থিরভাবে বসিয়ে দিতে হবে এবং নাক খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখতে বলতে হবে।
* পরিষ্কার তুলা বা কাপড় দিয়ে নিঃসৃত রক্ত মুছে ফেলতে হবে। এরপর হাতের আঙ্গুল দিয়ে কিছুক্ষণ নাক চেপে ধরে রাখতে হবে। কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ মিনিট নাক চেপে ধরলে সাধারণতঃ বড় ধরনের ক্ষত না হলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। নাক চেপে ধরার সময় মুখ দিয়ে রোগীকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হবে।

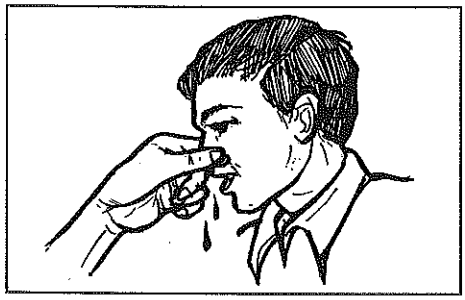

* নাক চেপে ধরার পরও যদি রক্ত পড়া বন্ধ না হয় তবে নাকের যে ছিদ্র দিয়ে রক্ত পড়ছে সে ছিদ্রের মধ্যে তূলা বা গজ ঢুকিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, কোনো অবস্থাতে যেন তুলা বা গজ নাকের ছিদ্রের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ না করে। তূলা নাকের মধ্যে প্রবেশের পূর্বে যেকোনো এন্টিসেপটিক যেমনঃ সেপনিল, স্যাভলন ইত্যাদি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে পারেন অথবা ভেসলিন ব্যবহার করা যায়। এরপর ৮ থেকে ১০ মিনিট আঙ্গুল দিয়ে নাক চেপে ধরতে হবে।
* রক্তপাত বন্ধ হওয়ার পরপরই নাকের ভিতরের তূলা বের করবেন না। কমপক্ষে ৩ থেকে ৪ ঘন্টা নাকের ছিদ্রের মধ্যে তূলা রেখে দিতে হবে। এরপর অতি সাবধানে তূলা বের করে ফেলতে হবে।
* নাকের মধ্যে জমাট বাঁধা রক্ত খুটবেন না। এতে আবার রক্ত পড়া শুরু হতে পারে।
* নাক দিয়ে রক্ত পড়া রোগীকে শুইয়ে রাখার চেয়ে বসিয়ে রাখা বাঞ্ছনীয়। এতে রোগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়।
* যদি কারও দিনে ২ থেকে ৩ বার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে তবে সামান্য ভেসলিন মাখা তূলা নাকের ছিদ্রের মধ্যে রেখে দেওয়া ভাল।
* তবে অনেক লোকের নাকের ছিদ্রের পিছনের দিক দিয়ে রক্ত পড়ে। সেক্ষেত্রে নাক চেপে ধরলে রক্ত পড়া বন্ধ নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে রোগীকে সামান্য মাথা নিচু করে সামনের দিকে ঝুঁকে শান্তভাবে

(৭-এর পাতায় দেখুন)

বন্যা পরবর্তীকালে কি করবেন

স্বাস্থ্য সংলাপের এ-সংখ্যা যখন পাঠকের কাছে পৌছবে তখন দেশের দু'শটি থানার প্রায় দেড় কোটি লোক বন্যা কবলিত হয়েছেন। প্রাণহানি ঘটেছে প্রায় ১০০ জনের।

ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়েছে বন্যা উপদ্রুত বিস্তীর্ণ এলাকায়। এসব রোগের মধ্যে রয়েছে আমাশা, রক্ত আমাশা, ভাইরাল হেপাটাইটিস, চর্মরোগ ইত্যাদি।

বন্যা পরবর্তীকালে মহামারীর প্রাদুর্ভাব সমতলীয় বাংলাদেশে চিরাচরিত ঘটনা। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবই এর মূল কারণ। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নলকূপই বিশুদ্ধ পানির একমাত্র উৎস। বন্যার পানিতে বহু নলকূপও তলিয়ে যায় এবং পানিবন্দী মানুষের জন্য দূষিত পানি পান করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

বন্যা পরবর্তীকালে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমরা সহজেই মহামারী রোধ করতে বা তার তীব্রতা কমিয়ে আনতে পারি।

আপনার করণীয় : —

- পানি সরে যাবার সাথে সাথে বাড়ির আশেপাশের ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করে ফেলুন।
- পানি ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে বানে ভেসে আসা মরাপচা জীবজন্তু, পশুপাখি মাটির নিচে পুঁতে ফেলুন।
- অবশ্যই নলকূপের পানি পান করুন। রান্না ও থালাবাসন ধোয়ার কাজেও একই পানি ব্যবহার করুন।
- নলকূপের পানি পাওয়া একান্তই অসম্ভব হলে এক কলসী পানিতে এক চা চামচ ফিটকিরি মিশিয়ে এক ঘন্টা অপেক্ষা করে ব্যবহার করুন।
- জলাবদ্ধ পায়খানায় মলত্যাগ করুন। বিকল্প হিসেবে, নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে মলত্যাগ করুন। প্রতিবার ব্যবহারের পর ছাই বা মাটি দিয়ে মল ঢেকে দিন।
- বন্যা দুর্গত এলাকায় কর্মরত সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকর্মী, মেডিকেল টীম, অভিজ্ঞ জনগণ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করুন ও তাদের পরামর্শ নিন।
- ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুসহ সকল রোগীকে খাবার স্যালাইন খেতে দিন। কয়েক প্যাকেট খাবার স্যালাইন ঘরে রাখুন সবসময়। ঘরে খাবার স্যালাইন তৈরির পদ্ধতি স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে জেনে নিন।

(৬-এর পাতায় দেখুন)

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; **সম্পাদক ঃ** ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ** এম. শামসুল ইসলাম খান; **কনসালটেন্ট এডিটর ঃ** ডাঃ মোড়ল নজরুল ইসলাম; **সদস্য ঃ** ইউসুফ হাসান, মুহম্মদ মুজিবর রহমান, ডাঃ তানজিনা মির্জা, ডাঃ শামীম এ. খান ও ডাঃ অমল মিত্র; **ডিজাইন ঃ** আসেম আনসারী; **প্রকাশক ঃ** আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০। ফোন ঃ ৬০০১৭১-৮; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬; টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আইসিডিডি বি জে

মুদ্রণে : ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ